চতুর্থ কমলা ভট্টাচার্য স্মারক বক্তৃতা ২০১৭

# চিকিৎসা, সেবা ও সমাজ

অভিজিৎ চৌধুরী

## Dr. Abhijit Chowdhury

Professor & Head, Department of Hepatology, School of Digestive and Liver Diseases, Institute of Post Graduate Medical Education & Research

## অভিজিৎ চৌধুরী

তিন বছরেরও কিছু বেশি সময় হল কৃষ্ণা ভট্টাচার্য তাঁর পার্থিব পথ চলা থামিয়েছেন। অনেক সময়ই আমাদের জীবনে এরকমটা ঘটে, যে ব্যক্তির সঙ্গে চাক্ষুস দেখা হয়নি কিন্তু তাঁর কথা জেনেছি, শুনেছি, ভেবেছি, তাঁর কাছ থেকে প্রেরণা পেয়েছি; এমন জীবনের কথা আমাদেরকে নাড়া দেয়। প্রাত্যহিকতায় ডুবে থাকা বরফশীতল মনে ঢেউ তোলে, সুর জাগায়। পৃথিবীটাকে আরও একটু সুন্দর করে তোলা, আরও সংবেদনসম্পৃক্ত করে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথা বলে। কৃষ্ণা ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে আমার পরিচয়টা এরকমই এক অপার্থিব কথকতার মধ্যে দিয়ে। এক বন্ধু উপহার দিয়েছিলেন অধ্যাপক রণবীর সমাদ্দারের লেখা 'কৃষ্ণা' বইটি। অচিকিৎসকরা চিকিৎসা বিজ্ঞানের গুঢ়তত্ত্ব নিতান্তই অতিসরলীকৃত এবং ভুল ব্যাখ্যা করেন—এই ভাবনায় লালিত আমার চিকিৎসকসত্তা হঠাৎই হিমেল হাওয়ায় ভেসে গেছিল বইটি পড়তে পড়তে। ধড়াচূড়া ছেড়ে নিজের তন্ত্রগুলিকে শাণিত করে পেশাকে অন্যভাবে চোখ মেলে দেখার জন্য তাড়িত হয়েছিলাম। আজকের এই স্মরণ-শপথের সন্ধ্যায় কৃষ্ণা মেমোরিয়াল ট্রাস্ট, ক্যালকাটা রিসার্চ গ্রুপ এবং রণবীরদা'র প্রতি কথা বলার এই সুযোগ দেওয়ার জন্য আমার কৃতজ্ঞতা। সমবেত সবাইকে আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাই। বক্তব্যের প্রান্তরে পৌঁছানোর আগে প্রেক্ষিতটা একটু খোলশা করা দরকার।

## চিকিৎসক ও মানুষের রোগভোগ

আমি পেশায় চিকিৎসক—ভাবতে ভালো লাগে নিজেকে সমাজকর্মী বলে। কিন্তু পেরে উঠি না অত বড় করে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে। খাঁচায় আটকানো টিয়াপাখির দশা আমাদের। খাঁচা থেকে বেরোলেও খাঁচার চারপাশেই ঘুরপাক খাই আর বারবার বলা কথাগুলিই মুখ দিয়ে বার করি। জীবনকে আমরা দেখি তার প্রলয়গ্রস্ত রূপে। জীবনের বিকশিত পদ্মপাতার মতো মসৃন, টলটলে অবয়ব আমাদের চোখে আসে না। দেখার সুযোগও হয় না। 'ডাক্তারবাবু' ডাকটাই যেন আক্রান্ত, ভারে নুয়ে পড়া কারুর পরমশ্রদ্ধায় গদগদ আহ্বান। হয় যুদ্ধক্ষেত্রে নামতে হবে, নয়তো বা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতে হবে সমাজ বিগলিত প্রণাম, যেটা আমরা আবার দাবিও করে থাকি উত্তরাধিকার সূত্রে। আর তা না পেলে অভিশাপ দিই সমাজে যথেষ্ট শ্রদ্ধার বাতাবরণ নেই বলে। পাবলিক (এই নামেই আমরা সমবেত, অচিকিৎসক জনসমষ্টির প্রতি ইঙ্গিত করি!) এবং পেসেন্ট পার্টি (এটা একটা অদ্ভুত পার্টি—কাল মার্ক্সও যা কখনও ভেবে উঠতেও পারেন নি। দেয়াল তুলে খেলার এরকম প্রতিশব্দ শুনেছিলাম চিকিৎসা-শিক্ষার অঙ্গনে ঢুকেই)—এদের দু তরফকেই আমাদের থেকে বেশ কিছুটা দূরে রাখি, সমীহ করি। আমাদের কাজকর্মের বিষয়ে এরা মাত্রাতিরিক্ত-অনুসন্ধিতসু বলে পরিতাপ করি। কখনও বা বিরক্তি প্রকাশও করি।

## চিকিৎসা, পরিচর্যা ও ব্যবসা

তবে এর মাঝেও আমাদের আরও একটা অস্তিত্ব আছে—যা মাঝে মধ্যেই খোঁচা দেয়। মৃত্যু উপত্যকায় জীবন গড়াতে গড়াতে, হৃদয়ের প্রকোষ্ঠ গুলিকে শুদ্ধবিশুদ্ধ, অলিন্দনিলয়, জীবন-মরণ এই নানান বিভাজিত ভাবনার মারপ্যাঁচে হাতের তালুতে বন্দী করে মাঝে মাঝে খুঁজে বেড়াই এর বাইরে পরিব্যাপ্ত জীবনের নানান রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ। সেই জীবন যাকে 'শরীর' নামক যন্ত্রের গলোযোগ দিয়ে মাপা যায় না। হোঁচট খেলেও, ভ্রুকুটি দেখলেও জীবনের শোভা যেখানে ম্লান হয় না। ভুলে যাই অসুস্থতা হচ্ছে ক্ষণিকের বিহ্বলতা। দীর্ঘ অসুস্থতা ঝুলনের মতো নাগরদোলায় জীবনকে নিয়ে হোলি খেলে। আমরা খুঁজে ফিরি তার কালো দিক, আলো দেখি না। যক্ষপুরীতে বাস করা এই অধমের মতো ফাগুলাল গোত্রের প্রাণী আমরা সবাই। মৃত্যুর ঘন্টা বাজাই স্বর্গীয় স্পর্ধায়। চিরকুটে খোদাই করা কিছু অক্ষরের ঝংকারে দাঁড়ি টানি জীবনের পথচলার—প্রতিস্পর্ধী ব্যঞ্জনায়। একটুও ব্যথা জাগে না সেই মুহূর্তে আমার তন্ত্রে। নিজেকে কখনও সৈনিক মনে হয়—কখনও কাপালিক। অর্ন্তদৃষ্টির ছট্‌ফটানিতে যদিও কখনও বা ঝিমুনি আসে—পরমুহূর্তেই গ্লাডিয়েটরের মতো ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়, ধুঁকতে থাকা অন্য একটি বা অন্য কয়েকটি জীবনের অঙ্গসজ্জায়। জীবন আমাদের কাছে আসে অঙ্কের ছন্দে। তার আলাপন মস্তিষ্কের সঙ্গে। বুকটাকে বেঁধে রাখি একটা প্রকান্ড দলা পাকানো পাটের রশিতে। ঢেউ যদি কখনও বা ওঠে সেখানে, তা যেন আবিষ্ট না করতে পারে। সৈনিক আর কাপালিক দুজনেরই চোখের জল ফেলতে নেই। বুকটাকে বাঁধতে বাঁধতে, সতর্ক দৃষ্টি দিতে দিতে, একসময় সেখানে পড়ে যায় প্রকান্ড চড়া। হাওয়া সেখানে বড়জোর

সুড়সুড়ি দিতে পারে, ঝড়ের মাতন আনতে পারে না। মাঝে মাঝে ভাবতেও ইচ্ছা করে—'আচ্ছা, আইনস্টাইন যখন বেহালা বাজাতেন তখনও কি মাথায় অঙ্ক ঘুরত'? এজন্যই তো তিনি আইনস্টাইন—সুর আর সার—দুটোকেই মিলিয়ে ছিলেন অসীম নিপুণতায়—সার্থকতায়।

রোগ আর রোগীর পরিব্যাপ্ত খন্ডহরে অর্ধেক জীবন কাটিয়ে হঠাৎই নিজেকে মানুষ বলে মনে হল কৃষ্ণা ভট্টাচার্যের জীবন সায়াহ্নের কাব্য পড়তে পড়তে। কৃষ্ণাদির সঙ্গে এভাবে আলাপের সঙ্গে সঙ্গেই আমার মনে হয়েছে নিছক যান্ত্রিকতার জীবন বাঁচানোর যে যজ্ঞে আমরা প্রতিদিন রত আছি তার তাল, সুর, লয়টাকে একটু কি বদলানো যায় না? তা কী কী ভাবে হতে পারে, বাধাগুলি কোথায় কোথায়—এখন সে আলোচনাই করব।

## চিকিৎসার কোনও শৈল্পিক সত্তা হয় নাকি!

সুন্দর জীবন হয়, অপরূপ বাগান হয়, মনোহারী হয় ঝর্ণার পথচলা—কিন্তু সুন্দর মৃত্যু? হয়কি? ভালো চিকিৎসা শব্দটার মধ্যে কোন সৌন্দর্য্য বোধের দ্যোতনা থাকে কি? নাকি চিকিৎসা বলতে বোঝায় মানুষকে শুধু বাঁচানো আর মৃত্যুকে দূরে ঠেলে দেয়ার কর্মকান্ডকে! এই শব্দগুলি আর প্রশ্নগুলি যে কোনো মেডিক্যাল কলেজে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন করলে—পাগল অভিধায় ভূষিত হবার সমূহ সম্ভাবনা। গালাগালিও জুটতে পারে। আর তা এ জন্যই যে, চিকিৎসা নামক বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের গায়ে এখানে ভাবনা, অনুভূতি, ইত্যাদি কাব্যিক পদার্থের কাদা ছোঁড়া হচ্ছে। বিজ্ঞান তো ভীষণ নৈর্ব্যক্তিক বস্তু—একদম কাঠ কাঠ তার

পল্লবগুলি। তার অকপট অঙ্গনে আবেগের ছায়া আলো না দিয়ে আনবে ঘোর অন্ধকার। বিজ্ঞানী হচ্ছেন আদতে রেসের ঘোড়ার মতো। সুনির্দিষ্ট চিন্তা নিয়ে, ক্ষুরধার বুদ্ধি দিয়ে স্ফটিক স্বচ্ছ দৃষ্টির জোরে ছুটবেন, প্রকৃতির আর মানুষের এখনও না বোঝা, না জানা তথ্যগুলি তুলে আনার জন্য প্রাণপাত করবেন। এ কাজ করতে গিয়ে তিনি যদি ইন্দ্রিয়াবিষ্ট হয়ে পড়েন—তাহলেই ফস্‌কেছে। মূল কাজই হবে না। আর আজকের দুনিয়ায়—যেখানে সবাই এক একটা বিশেষ বিষয় পারঙ্গমতার জন্য এক নির্বিষ্ট চিত্তে কাজ করছেন—সেখানে এই আবেগ রোগ কিংবা ভাবদোষ বেগবান হলে হোঁচট খাবো অনিবার্য। বিজ্ঞানও হবে না, কবিতা সাহিত্যতো নয়ই।

আমাদের এক শিক্ষক ছিলেন। তিনি যতদিন চিকিৎসার অঙ্গনে ছিলেন ততদিন কায়-মন দিয়ে সেটাই করতেন—অসামান্য দক্ষতা আর পরম সততার সঙ্গে। দক্ষতা আর সততার পারস্পরিক বৈরীতা আছে বলে ইদানীং দক্ষতর শিল্পীদের মুখে প্রায়ই শুনে থাকি। মানে হয় দক্ষ হবে নয় হবে সৎ—এর কোনও একটা হতে হয়। দক্ষ হলেই নাকি তার অসৎ হওয়ার অধিকার জন্মায়! (যে ভাবেই ব্যাখ্যা করি না কেন!) তো সেদিক দিয়ে দেখলে এই ভদ্রলোক ছিলেন সেই 'জুরাসিক' প্রজাতির প্রাণী। অবসরের পর ডুবে গেলেন সম্পূর্ণ অন্য এক জগতে—'জীবনানন্দ' চর্চায়। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত জীবনানন্দ সুধাপানে নিজেকে ব্যস্ত রাখলেন। একদিন চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি প্রশ্ন করায় এই নতুন সময়ে, বলেছিলেন—'চিকিৎসক ভদ্রলোককে খুঁজছেন? তার প্রেতাত্মা এখন অন্য সাধনায় মগ্ন। আপনি কি সেই সাধনার সঙ্গী হতে চান? তাহলে আপনার সঙ্গে আলাপ হতে পারে'। জীবনের এই দ্বিভাজিত রূপ সন্দর্শনে নিতান্তই বিমোহিত আমি প্রশ্ন করেছিলাম— ''জীবনানন্দ- চর্চা

আর চিকিৎসা- বিজ্ঞান এর দুটোই একসঙ্গে হয় না কি!'' ''মানে আপনি বলছেন—দুধ আর মদ এক সঙ্গে? একগাল হেসেছিলেন, 'আমি পারিনি সেটা করতে—হয়ত বা কেউ করবেন।' এ প্রশ্নটা এখনও আমাকে নাড়া দেয়। আপনাদের প্রত্যেককে ভাবতে বলবো—অবশ্যই তাঁরা, যাঁরা ভাবতে চান। বিজ্ঞান আর নান্দনিক বোধ, শিল্প সাহিত্যের চর্চা এ দুই বস্তুগুলি কি এতো সরল রেখা দিয়েই বিভাজিত? নাকি আমরা এ রকম একটা দেয়াল তুলে বিজ্ঞানকে নিস্প্রাণ করেছি, করছি রিক্ত—আর সাহিত্যকে করছি দীন। এই দুটির সম্মিলনে কি আদতে পরস্পর সহযোগী জ্ঞানচর্চার দুটি ধারাকে নিষ্ঠুরভাবে আলাদা করে আমরা কালের প্রতি অবিচার করছি না?

এটা সব থেকে চোখে পড়ে চিকিৎসাবিদ্যায়। পদার্থবিজ্ঞান বা রসায়নের মাঝখানে কোন রক্ত নেই, মাংস নেই, মন নেই, চেতনা নেই। কিন্তু চিকিৎসায়? অনু-পরমাণু গুলোকে জড়ো করে তৈরী করা এক প্রাসাদে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে মন আর চেতনা। ভালো লাগা, ভালোবাসা, ভাবতে পারা, হাসি, কান্না এরই ফসল। মন আর চেতনাকে কিন্তু গাণিতিক সমীকরণের কোন কর্কশ ও অসৃষ্টিশীল এবং সরলীকৃত জীবন মাপার যন্ত্রে ধরা যায় না। অনেকেই চেষ্টা করেন—যেমনটা চেষ্টা হয় মানব উন্নয়নের আকারকে সূচক দিয়ে বাঁধার। মনের নিবাস কোথায়—এখনও কোনও বিজ্ঞানী তা বুঝে উঠতে পারেননি। চেতনা বা বুদ্ধির তাও কিছু বাসযোগ্য কৈলাশের খোঁজখবর মিলেছে। কিন্তু 'মানস-সরোবরকে' রসায়ন দিয়ে বন্দী করার চেষ্টা এখনও ব্যর্থ। এ দুটিরই আলোচনার অবতারণা। এজন্যই যে কোনো এম আর আই, সি টি স্ক্যান, আল্ট্রাসাউন্ড কিংবা এন্ডোস্কোপীর ঝনঝনানিতে এগুলির রহস্য উদ্‌ঘাটন হয় না। অন্যদিকে বাঁধাধরা গন্ডির মধ্যে লাট্টুর মতো ঘুরতে অভ্যস্ত চিকিৎসা-বিদরা

(বিজ্ঞানী শব্দটা এখানে আমি সযত্নে পরিহার করছি)। টালুর টুলুর চোখে চেয়ে থাকেন—চোখ বুজে কিছু অক্ষরে বাঁধেন মানুষের সমস্ত সমস্যাকে। কিছু ওষুধ লেখেন অবশ্যই—কিন্তু কেন লিখছি—তার ফলে কিই বা পাওয়া যাবে—সে সম্পর্কে ধারণা থাকে অনেক সময়ই নিতান্তই অস্বচ্ছ। প্রচলিত চিকিৎসা বিদ্যা—এভাবেই বিজ্ঞানের নামকে এগিয়ে চলে হনহন করে। তার বাইরেটা আপাদমস্তক 'কারিগরের'—আর তলানিতে কোথাও বা থাকে বিজ্ঞানের ঐ অনু-পরমাণু বোধ।

আদতে চিকিৎসা, কখনওই বিশুদ্ধ, অবিমিশ্র শুধু বিজ্ঞানের রূপ নিয়েই পথ চলতে পারে না। যেমনটা পারে অঙ্ক, পদার্থবিদ্যা কিংবা রসায়ন। (মনে রাখা দরকার যে পদার্থবিদ্যাতেও অন্তর্দৃষ্টির ভূমিকা প্রবল—যেমনটা অঙ্কতে)। বিজ্ঞানের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে মানুষকে ভালো রাখা আর রোগ ভোগ থেকে বার করে আনার কাজটা সুচারু ভাবে করতে গেলে চিকিৎসা-বিদ্যাকে অবশ্যই হাত পাততে হয় মানুষের শৈল্পিক সত্তা বোধ, সক্ষমতা আর পারঙ্গমতার কাছে। মানুষের কষ্টানুভূতির ভাষা এবং তার প্রকাশ বিজ্ঞান চিন্তা দিয়েই শুধু ধরা যায় না। মানুষের কষ্ট কমানোর কাজে যিনি নিয়োজিত সেই চিকিৎসকের অনুভুতি অন্তর্দৃষ্টি আর বোধের উপর তা নির্ভরশীল। বোধই এখানে বিধিকে নিয়ন্ত্রণ করে। সমস্যাটা হয় চিকিৎসাবিধির বাঁধাধরা গর্তে যখন চিকিৎসক পা রাখেন। নির্বোধের (বোধ এখানে শুধু ব্যবহৃত বিষয়টিকে বোঝাতেই—বোঝাচ্ছে অনুভুতি রিক্ত ও দীন ব্যক্তি) হাতে বিধি হয়ে যায়। রোগ সারাতে নিয়ে গুলি ছোঁড়ার মতো হয় তা। চিকিৎসাকে সুন্দর হতে গেলে ফুল বাগানের মালির মতো কাজ করতে হয়। পোকায় খাওয়া ফুল দেখে যেন হৃদয়ে তা ব্যথার অনুরণন তোলে। অসুস্থ মানুষ হচ্ছে কীটদষ্ট ফুলের মতো, তার নিরাময়ে সংবেদনশীলতা

দরকার, নান্দনিকবোধ দরকার। চিকিৎসক তাই যুদ্ধক্ষেত্রের সৈনিক কবি, উইলফ্রেড আওয়েন কিংবা ব্যালফ ফস্ক গোত্রের। নিরাময়ে অস্ত্র প্রয়োগটা যেন ছবি আঁকার দক্ষতা, ঠোঁট দিয়ে কথা বলে, আঙুল চালিয়ে প্রেসক্রিপশেন লিখেই শুধু ভালো চিকিৎসক হয় না। চিকিৎসা একদিকে সৌন্দর্যবোধের ধারণায় সম্পৃক্ত, অন্যদিকে সমাজ চেতনার দীপ্ত এক বিজ্ঞান। বিজ্ঞান এখানে দেহের হাড়-গোড় এবং মাংস। তার প্রয়োগ কুশলতা এবং ক্ষেত্রবিন্যাস নান্দনিক বোধের উপর নির্ভরশীল। এখানে উল্লেখ করা দরকার, যন্ত্রায়িত আধুনিক চিকিৎসা ক্রমাগত এই সৌন্দর্যবোধের জায়গাটাকে ছোট করছে, জীবনকে বাঁধতে চাইছে প্রোফাইলের গহ্বরে। বাণিজ্যে সাহায্য করলেও তা চিকিৎসা বিজ্ঞানকে ক্রমশ করছে রূঢ়, নিষ্প্রাণ। পণ্যের পসরা সাজিয়ে রোগের আবাহনে আপাদমস্তক ডুবে থাকা কর্পোরেট ব্যবস্থার নাগপাশে আমাদের দেশ যত আবদ্ধ হচ্ছে ততোই যন্ত্রের ঝন্‌ঝনানি শোনা যাচ্ছে। শুধু শিল্প আর কারিকুরি দিয়ে চিকিৎসা করলে তা হাতুড়ে বিদ্যা হয়, আমরা তাকে ব্যঙ্গ করি—সঠিক ভাবেই। যন্ত্রসর্বস্ব আধুনিকতা শুধু জীবনের ক্ষতিই করে না, আর্থিক ও সামাজিক ক্ষতিও করে। এটা আমাদের বোঝা দরকার।

আর সুন্দর মৃত্যু? হ্যাঁ, সেটা সুনিশ্চিত করাও সংবেদনশীল, সভ্য, ভদ্র সমাজের কাজ। চিকিৎসা বিদ্যারও অঙ্গ এটা। সবাইকে বাঁচানো যায় না—সেটা সবাই জানেন। কিন্তু মৃত্যুকে সহনীয় আর কম কষ্টদায়ক করে তুলতে গেলে চিকিৎসকের হৃদয়বত্তা, শৈল্পিকসত্তা, সততা আর ধৈর্যের ভূমিকা বিজ্ঞানের ধারের থেকে বেশী। আমাদের সমস্যা এই যে, মৃত্যুর পথ সাবলীল ও সহনীয় করার আখড়াগুলিতেও এখন বাউল গানের বদলে রক শিল্পীদের আনাগোনা। শান্তিতে, নিজের মতো মরতে চাইলেও—তা সহজে পারবেন না। ভেন্টিলেটরের

নাগরদোলায় যদি একবার চেপেছেন তো রক্ষে নেই! কোনো এক মুহূর্তে আমরা বোধহয় লাগাম টানব এই অগস্ত্য যাত্রায়। আপাতত তারই প্রতীক্ষা।

## বিজ্ঞানের স্পর্শ, আলো আর নাগপাশ! চিকিৎসার মঙ্গলযাত্রা

মঙ্গলগ্রহে প্রাণের খোঁজ চলছে—হয়তো বা পাওয়াও যাবে অচিরেই। সহস্র বছর পরে সেখানে মানুষের বসতিও হতে পারে। চিকিৎসা ব্যবস্থা লাগবে, চিকিৎসক লাগবে। পৃথিবীটা যদি ততদিন অক্ষত থাকে তাহলে এখান থেকে উন্নত চিকিৎসাবিজ্ঞানী আলো নিয়ে মঙ্গলে যাবেন। অবশ্যই কাব্যের উপর ভর করে তা হবে না—শিল্পের ভরসাতেও নয়। বিজ্ঞানই হবে তার হাত পা। বিজ্ঞান ছাড়া কোনো চিকিৎসাবিদ্যা হয় না—এ ব্যাপারটায় কোনও দ্বিমত বা সংশয় থাকা চলে না। এতক্ষণ ধরে আমি যেভাবে শৈল্পিক চিকিৎসার পক্ষে ওকালতি করেছি, তাতে মনে হতে পারে (এবং তা মূল যুক্তি হিসাবে খাড়া করে দেবার প্রচেষ্টাও করেছি বলে উপস্থাপিত করা হতে পারে) তাতে মনে হতে পারে যে, আমার মূল লক্ষ্য চিকিৎসায় বিজ্ঞানের ভূমিকাকে খাটো করা। একেই আরো প্রসারিত করে এরকমও প্রস্তাবনাও হতে পারে যে, আমি আদতে চিকিৎসকদের বৈজ্ঞানিক শক্তিকে ছোটো করতে চাই। এমনিতেই অপ্রশিক্ষিত গ্রামীণ স্বাস্থ্য কর্মী—যাঁরা প্রায়শই ভুল ভাবে নিজেদের 'চিকিৎসক' হিসাবে জাহির করেন—তাঁদের প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তার পক্ষে আমার ভূমিকায় চিকিৎসকরা কেউ কেউ মনে করেন, আমি তাঁদের চিকিৎসকের বিকল্প ভূমিকায় তুলে ধরার মতো নিতান্তই খারাপ কাজে লিপ্ত। এর কোনওটাই সঠিক নয়। স্বাস্থ্যকর্মীরা চিকিৎসক বা তার বিকল্প হতে পারেন না।

কাজেই এটা যাঁরা ভাবেন, তাঁরা যথেষ্ট বিবেচনা প্রসুত ভাবে ভাবেন বলে মনে হয় না। হয়তো এর মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয় নিরাপত্তাহীনতা। এই নিরাপত্তাহীনতার কেন্দ্রে আছে চিকিৎসাবিদদের মধ্যে বিজ্ঞানচিন্তার অনুশীলনের অভাব। এই অভাব থেকেই জন্ম নেয় আত্মশ্রদ্ধার ঘাটতি। আর তখনই অন্যদের নিজের পেশাগত প্রতিপক্ষ বলে মনে হয়।

গ্রামীন স্বাস্থ্যকর্মীরা যাঁরা আর. এম. পি নামে সমধিক পরিচিত—তাঁরা মূলতঃ ঔষধ এবং চিকিৎসার নানান প্রকরণ এবং কৌশল রপ্ত করে, জীবিকার প্রয়োজনে তা বিক্রি করেন গ্রাম ভারতের মানুষের কাছে। এঁরা অপ্রশিক্ষিত, বিজ্ঞানের উত্তাপ এঁদের কেউ দেয়নি। এঁরা প্রধানত প্রশিক্ষিত, মূলধারার চিকিৎসকদের অনুকরণ করেন। তাই এঁদের অনুকরণে মূল ধারায় সুস্পষ্ট ছাপ থাকে। যেটা লক্ষণীয় তা হচ্ছে, এঁদের মন্দ কাজেও মূলধারার ছাপ থাকে। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের হলেও এটা বিভিন্ন গবেষণায় প্রমাণিত যে, ডিগ্রিপ্রাপ্ত চিকিৎসকরা এদেশে যতটা বিজ্ঞানের ভরসা করে চলেন। তার থেকে বেশী নির্ভর করেন বাজারের প্রয়োজনীয়তার উপর। বাজারের কাছে গ্রহণযোগ্যতা তৈরী করতে গিয়ে মূলধারার উন্নত চিকিৎসকেরা এমন অনেক কান্ড কারখানা করেন—যার যে শুধু বৈজ্ঞানিক ভিত্তিই নেই তাই নয়, তা অনেক ক্ষেত্রেই অপ্রয়োজনীয় এবং ক্ষতিকারক। ভুল করেও যদি পার পাওয়া যায়, (সেটাই আমাদের দেশের নিয়ম), তাহলে সেটাই একসময়, প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়—নিয়ম হিসাবে। সরকারি এবং বেসরকারি কোনও চিকিৎসা ব্যবস্থাতেই ব্যবহারিক নিয়ন্ত্রণের কোনো ব্যবস্থা এদেশে নেই। আইন আছে—কিন্তু তার প্রয়োগ হয় কদাচিত, তাও শুধুমাত্র সামাজিক প্রলয় হলে তা সামাল দিতে। সরকারি চিকিৎসা-ব্যবস্থাকে এদেশে কখনওই সেভাবে মানুষের নির্ভরশীলতার জায়গায় পৌঁছে দেবার চেষ্টা করা হয়নি, আর এর নিতান্তই মলিন রূপের সুযোগ নিয়ে

আবির্ভূত হয়েছে বেসরকারি এক কিম্ভুত কিমাকার ব্যবস্থা।

এখানে চিকিৎসকদের ভাবা হয় উন্নত প্রজাতির বিক্রেতা হিসাবে। আমরা লিভার ফাউন্ডেশন ও এম আই টি যৌথ গবেষণায় দেখেছি, গ্রামাঞ্চলে অপ্রশিক্ষিত চিকিৎসকরা অপ্রয়োজনীয় ওষুধের ব্যপক প্রয়োগ করেন—এমনকি, এন্টিবায়োটিকেরও। এই ক্ষতিকারক প্রভাব প্রশিক্ষণের মধ্যে দিয়েও কমানো যায় না। আর তুলনামূলক ভাবে অপ্রশিক্ষিতদের থেকেও বেশী অপ্রয়োজনীয় ওষুধের ব্যবহার করেন পাস করা চিকিৎসকেরা। আমি উল্লেখ করতে চাই যে, এই নিতান্তই দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির নিবন্ধীকরণ করতে গিয়ে আমার বুক কেঁপেছে—মাথা ভারি হয়েছে, কিন্তু এটাই বাস্তব তেতো হলেও তা গিলতে হচ্ছে আমাদের সবাইকে, নইলে বাস্তবতার সঙ্গে তঞ্চকতা করা হবে। আমি এ পেশায় আছি, অতএব পেশাগত অন্ধকার গুলোকেও মহান বলে সংকীর্তন করতে হবে তা হয় না। আমাদের কাজ অন্ধকার কমানোর। সমস্যাটা আরও ব্যাপক। প্রয়োজন, অপ্রয়োজনে, যন্ত্রের প্রয়োগ (এবং অবশ্যই অপপ্রয়োগ) যে নতুন চিকিৎসা সভ্যতার জন্ম দিচ্ছে তা আমাদেরকে আরও ভীত, সন্ত্রস্ত করে তোলে। একদিকে বিজ্ঞানের আলো পৌঁছতে না পারা আর অন্যদিকে বিজ্ঞানের ছ্যাঁকা খাওয়া—এই সাঁড়াসী আক্রণে উন্নত চিকিৎসার নামে যা চলছে তাকে অপরাধ বলতে দ্বিধা নেই। এটা নিতান্তই অথগৃধ্নুতা প্রসূত একটি ব্যবস্থা—কর্পোরেট চিকিৎসা ব্যবস্থা। সরকারি ব্যবস্থার রক্তাল্পতার ফলেই তা এতটা জায়গা পেয়েছে। সব থেকে বড় সমস্যা এখন এটাই যে, এই অব্যবস্থা এখন স্পর্ধা দেখাচ্ছে মূল ব্যবস্থা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। সাধারণভাবে তস্করদের গলা উঁচু হয়। সুজন সাধারণত ক্ষীণকণ্ঠ হয়। আর সেই সুযোগেই দুর্জনেরা করে রাজপথ অধিকার। চিকিৎসা ব্যবস্থার গুণগত ক্ষেত্রে এদেশের এবং আরও

নির্দিষ্ট ভাবে এ রাজ্যে এখন তারই ছাপ। এটাকে প্রতিহত করা দরকার। আর তা করতে গেলে বিজ্ঞান-সম্পৃক্ত, সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই তা করতে হবে।

সামগ্রিক ভাবে বিজ্ঞানের এসিয়ে যাওয়া আর চিকিৎসা- বিদ্যায় তার প্রয়োগ বিভিন্নভাবে আমাদেরকে সমৃদ্ধ করে। আমাদের দেশে বিজ্ঞানের অগ্রগতির নানান উপকরণগুলি ইদানীং পৌঁছয় পশ্চিম দেশ থেকে দ্রুততার সঙ্গেই। কিন্তু ঔষধ, যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে সেই সুফলগুলি চিকিৎসা ব্যবস্থায় পৌঁছয় মূলত বাজারের হাত ধরে। তাতেও অসুবিধা নেই। সমস্যা যেখানে তা হচ্ছে—এদেশে চিকিৎসার বাজারটি ভীষণ অনিয়ন্ত্রিত, ব্যবহারিক, গুণগত এবং আর্থিক সব দিক থেকে। প্রায় কোনো হিসেব নিকেশই হয় না, কী করা হল—কাকে নিয়ে তা করা হল ইত্যাদি নিয়ে। ফলে বিজ্ঞানের অগ্রগতির সুফল আমরা যতটা পাই তা যতটা পাওয়া দরকার তার থেকে কম। বিষয়টি নিয়ে অচিকিৎসক, বিজ্ঞানী নন এমন মানুষেরও ভূমিকা আছে। সেটা উল্লেখ করার জন্যই এখানে এই প্রসঙ্গটির আলোচনা। সামগ্রিকভাবে বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ দিক গুলি না বুঝতে পারলেও তার প্রায়োগিক ভূমিকাটা বুঝতে গেলে সাধারণ মানুষকে যে বিজ্ঞানবেত্তা হতেই হবে এমনটা নয়। সরল সাধাসিধা চোখ দিয়ে বিজ্ঞানের চলাফেরার গতি ও অভিমুখ ধরা যায়। আর চিকিৎসা যেহেতু প্রতিদিনের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে তাই সেখানে বিজ্ঞানের চলাফেরা আরও সহজে বুঝতে পারে। সমস্যাটা হয় বিজ্ঞানের ধারালো অস্ত্রগুলি যখন অপ্রয়োজনীয় ভাবে ব্যবহার করা হয়। এর সব থেকে বড়ো প্রমাণ অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহারে। যত বড় হাসপাতাল, যত দামী ডাক্তার, তত শক্তিশালী ওষুধ। এই ধারণার মূলভিত্তি এটাই। আর তার দাঁত-নখ সবই বেরোয় সব থেকে আগে অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে।

বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফসলগুলির প্রয়োগ নিয়ন্ত্রণে সাধারণভাবে নাগরিক সমাজের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। যা প্রয়োজন তা হচ্ছে প্রশ্ন তোলার মানসিকতাকে দৃঢ় করে, অভ্যাসকে রপ্ত করা। এরই পাশাপাশি বিধি তৈরীতে সরকার এবং অন্যান্য নিয়ন্ত্রকদের সচেতন করাও বিজ্ঞানকে ফলদায়ী করার জন্য প্রয়োজন।

## পরিচর্যা, চিকিৎসা, ব্যবসা

ইদানিং চিকিৎসার সেবা-রূপদর্শনে অনেকেই খুব কম্পিত হচ্ছেন। সমাজগঠন ও রক্ষার জন্য যে ব্যবস্থাগুলির দিকে মানুষ আকুতি আর পরম অসহায়তা নিয়ে চায় তার মধ্যমণি চিকিৎসা ব্যবস্থা। কল্যাণকামী রাষ্ট্রব্যবস্থা তাই চিকিৎসার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পেশাগুলিকে একটা অন্যরকম শ্রদ্ধাঘন আসনে বসায়। আর যা আশা করে তা হচ্ছে মানুষের সঙ্গে পেশায় এই সম্পর্কটা শুধু পরিচিতি বিনিময়ের হবে না। দেনা-পাওনার গণ্ডিতে বাঁধা পড়বে না। যদিও বা তার মধ্যে অর্থের বিনিময় থাকে তাও তার স্পর্শ অন্যরকম হবে। থাকবে এক অদৃশ্য বন্ধন- চিকিৎসা কর্মী এবং অসুস্থের মধ্যে। এই বন্ধন দৃঢ় করার জন্যই চিকিৎসকদের পেসায় প্রবেশের দিনটিতে পাঠ করতে হয় শপথ বাক্য যার কেন্দ্রে থাকে এই দায় ও দায়িত্বের কথা- শর্ত ও বিনিময়হীন রূপেই। ভারতবর্ষের চিকিৎসা ব্যবস্থা চিরকালই বহুমাত্রিক। সেখানে দীর্ঘকাল ধরেই সরকারি ব্যবস্থার পাশাপাশি বেসরকারি ব্যবসায়িক উদ্যোগ ছিল। তা কিন্তু কখনও চিকিৎসা দাতা আর গ্রহীতার মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধার সম্পর্ককে নিয়ে ততটা চিন্তিত হয়নি, যতটা এখন হচ্ছে।

অর্থনীতির উদারীকরণ নামের খোলা হাওয়ায় উড়ে এসে বেশ কিছু মাছি ও মশা এ দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থার জমা জলে ডিম পেড়েছে, বসত করছে। তার মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য বস্তু হচ্ছে কর্পোরেট চিকিৎসা ব্যবস্থা। পা-পিছলানো মার্বেলে মোড়া মেঝে, আতিথেয়তার জগঝম্প, বিজ্ঞাপনের ভারী ভারী শিলালিপিতে কী কী পাওয়া যায় তার বিবরণ, কেমন যেন বিদেশ বিদেশ পরিবেশ আর অত্যাধুনিকতায় ভরা নানান যন্ত্রপাতি—এই হচ্ছে এই চিকিৎসা ব্যবস্থার অঙ্গভূষণ। উন্নত চিকিৎসার একমাত্র শর্ত হচ্ছে, নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নিগড়ে রোগীকে বাঁধা চিকিৎসকের চোখ, হাত। স্টেথোস্কোপের জোর আর চলে না। কাগজে আর কম্পিউটারের স্ক্রিনে ভেসে ওঠা সংকেতের মধ্যেই রোগীর কুষ্ঠিঠিকুজির বিচার হয়। তারপর চলে এঘর-ওঘোর ঘোরাফেরা, যার গর্ভগৃহ হচ্ছে বিলিং পদ্ধতি। কলের জলের মতো অর্থব্যয়ে জীবন হয়তো বা ভেসে ওঠে এবারের মতো। কিন্তু বাকী জীবন হয়ে যায় প্রায় সম্পূর্ণ ভঙ্গুর। আর্থিক ও সামাজিক অভিঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয় পরিবার, আত্মজনের প্রতিদিনকার বাকি জীবন। ভারতবর্ষের মানুষের দারিদ্র সৃষ্টির অন্যতম গভীর হাঁ-মুখ হচ্ছে এই কর্পোরেট চিকিৎসাব্যবস্থা। কী কিনছি তার কোন স্বচ্ছতা নেই। কেন কিনছি তা ধোঁয়াশায় ঢাকা। কী দামে কিনছি তারও কোনও নিশ্চয়তা নেই। পণ্য—হয়েছে কিন্তু তা বাজারের অন্যান্য পণ্যের মতো নিয়ন্ত্রণে আসেনি। মূল্যেরও কোন সূচক নেই। সবটাই খেয়াল খুশী মতো।

দেশের সরকারও চিকিৎসা ব্যবস্থায় এই অপ্সরীর প্রেমে মগ্ন। দেশের মানুষের চিকিৎসায় সরকারের দায় কমানোতে সাহায্য করেন এঁরা। স রকার ও তার পরিচালক বর্গ সরকারি ব্যবস্থার প্রতি আস্থা হারিয়েছেন। তাকে মলিন করে তার মালিনতাকে অপরাধ ও দীন

রূপকে অপরিবর্তনীয় অসুখ হিসাবে চিহ্নিত করে, সরকারি চিকিৎসা-ব্যবস্থাকে আরও হীনবল, ক্ষীণকণ্ঠ করে তোলা হচ্ছে। বেসরকারি কর্পোরেটের জাঁক-জমক, ঠাঁট-বাটে বিভ্রান্ত সাধারণ মানুষও। মোমবাতির পাশে ঝাড় লণ্ঠন যেমন গমগমিয়ে চোখ ধাঁধায়, সেরকমই। দৃষ্টি সর্বস্ব এই সত্তাবিহীন ও আত্মরিক্ত ব্যবস্থা আজ দেশের সামাজিক অসুস্থতায় সব থেকে বড় প্রতীক হয়ে আবির্ভূত হয়েছে। নগর ছাড়িয়ে এই ব্যবসা এখন তার বিষ ফণা তুলছে মফস্বলের শহরে গ্রামে। সবমিলিয়ে এ এক রমরম করা ভাটিখানা। চাল, ডাল, তেল, নুন কিংবা গোবর সারের ব্যবসাতেও যিনি দু'পয়সা করেছেন তিনিও এখন এই ব্যবসায়। এখানে লাভ গেঞ্জির মতো বাড়ে টানলে পরে। এর ভাষা, এর সুর, এর তাল একবার রপ্ত করতে পারলে সপ্তডিঙা মধুকরের সমৃদ্ধিকেও তা হার মানায়। আলু পটলের দাম বাড়িয়ে ধরা পড়লে ব্যবসা কমতে পারে, শাস্তি হতে পারে। কিন্তু চিকিৎসায় মুনাফা সুনিশ্চিত, অবাধ। শুধু পাড়ার মাত ব্বর, রাজনৈতিক দাদাকে রসেবসে রাখা। বিল নিয়ে ঝামেলা হলে 'বক্সার' সামলাবে—মদের আখড়ায় ঝামেলা সামলাতে যাদের ডাক পড়ে তারা নতুন কাজের অঙ্গন পেয়েছেন।

অবাক লাগলেও এর সবকটাই হচ্ছে কর্পোরেট চিকিৎসা ব্যবস্থার চলা ও বলার নানা ভাষা। লাভই এখানে মোক্ষ-সাফল্যের মাপকাঠি। কটা মানুষের জীবন বাঁচল বা কতজন চিকিৎসিত হলেন তা শুধু কাঁচামাল গুদামজাত করার মতো। জীবনের মূল্য এখানে লাভ এবং লোভের কড়ির রসদ। রোগের ভূমিকা ততটাই যতটা তা যতদিন হাসপাতালে ভর্তি থাকাকে সুনিশ্চিত করতে পারে। যদিও বা গুরুতর রোগ নাও হয় তাতে কি! আপনার অসুস্থতা যদি অঙ্কের নিয়মেই পাঁচ হয়—তাকে পঞ্চাশ বলে আপনাকে শয্যাশায়ী করা এবং নিতান্তই

অসহায় বোধ জাগিয়ে তোলাই এ সংস্কৃতির ভূষণ। তার পরই চলে নানান ছলা-কলা। রোগ যার নেই, তার রোগ সারানোটাও কঠিন নয়। সাফল্য এখানে অবধারিত, আর নিরোগ শরীরে দুর্লভ অসুখের ছাপ্পা লাগিয়ে চলে যন্ত্রের দাপাদাপি, পরীক্ষা-নিরীক্ষার ছলাকলা, গম্ভীর মুখে নিদান ঃ সমস্যা জটিল, কিন্তু চেষ্টা চলছে। লাভ সুনিশ্চিত, কারণ যিনি অসুস্থ বলে ছাপ পেয়েছেন তিনি আদপে সুস্থ। বেশ কিছুদিন বিজ্ঞানের অত্যাচার সহ্য করার ক্ষেত্র ও ক্ষমতা জারী রাখবেন এবং শেষমেষ—আহা কি পেলাম বলে সুচিকিৎসার গুণগান করতে করতে বাড়ি ফিরবেন। দেশে এখনও বেশীর ভাগ মানুষের কোনও রোগ নেই। কিন্তু বাণিজ্যিক চিকিৎসার উদগ্র আহ্বানে 'আমারও বোধহয় ঐ অসুখটা হয়েছে'—এটা ভাবেন না এরকম দৃঢ়চেতা মানুষের সংখ্যা ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে। পথে ঘাটে বুকে ব্যাথা হলে, মাথা ঝিম্‌ঝিম্‌ করলে, পেট ভুটভাট করলে কত বড় বিপদ ঘনিয়ে আসতে পারে—তারই বিজ্ঞাপন। বেশ কয়েকবার চোখে পড়ার পরে তাতে প্রভাবিত না হওয়াটাই অস্বাভাবিক। হাড়ের বা পেশীর সমস্যায় বুকে ব্যথা হওয়া ব্যক্তিরও অনুভুতি হয়—'আমার হার্টের সমস্যা হয়নি তো?' ব্যাস্‌ ওখানেই শুরু বিজ্ঞানের সাপের খেলা। যার শেষ হবে অ্যাঞ্জিওগ্রাফী দিয়ে।

এরপরে টিন্‌সেল টাউনে প্রবেশ—আই.সি.ইউ। যেখানে আপনার মতোই বা সত্যিই আপনার মতো নয় এবং কিছুটা হলেও অসুস্থ মানুষজন বোজা চোখে যন্ত্রের টুংটাং আওয়াজ, চিকিৎসক—সেবিকাদের সন্ত্রস্ত পদচারণার হিসাব করছেন। সেখানের সঙ্গীত হচ্ছে—আজকে সিআরপি-টা কেন বেশি, প্রোক্যালটা আগের থেকেও বেড়ে গেছে—একে বেড়ে দেওয়া যাবে না। আই.সি.ইউ. হচ্ছে কর্পোরেটের হীরের গয়না—তা দেখাতে পারলেই এঁদের সার্থকতা। অতএব আপনি যদি সত্যিই কিছুটা, একেবারেই কিছুটা—রোগগ্রস্ত হন,

তাহলে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই শুনবেন পুতুলের গানের মতো—'আপনার অসুখ গুরুতর' এবং আই.সি.ইউ. ভ্রমণই আপনাকে এর হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। আপনি হাত তুলে আত্মসমর্পণ করবেন, এবং আপনার আত্মীয়স্বজন দিনরাত উৎকণ্ঠায় অপেক্ষা করবেন কাঁচের দরজার বাইরে। কত খরচ হবে তার কোনো উর্ধসীমা নেই এখানে। কোনওক্রমে জটিলতা বেড়ে যদি ভেন্টিলেটর নামক গুপীযন্ত্রের স্পর্শসুখ পাবার সৌভাগ্য হয় তাহলে তো স্বর্গলাভ। হাঁপরের মতো জীবন ওটানামা করবে দিন কিংবা সপ্তাহ খানেক যন্ত্রের অঙ্কশোভিত ডিসপ্লে বোর্ডে। আর তার পিছনে কাকতাড়ুয়া গোছের কিছু মানুষ—যারা শুধু জানেন যন্ত্রের আওয়াজ কানে ঢোকাতে আর কিছু তোতা-পাখীর মতো শেখানো বুলি বাড়ির লোকেদের বলতে। এ এক অদ্ভুত অন্ধকারের সভ্যতা। উল্লেখ করা প্রয়োজন এর সবটাই যে এরকম তা নয়। বেশকিছু জায়গা আছে যেখানে বিজ্ঞানটা সদর্থক রূপেই আসে এবং চিকিৎসকরাও সংবেদনশীল ভাবেই চিকিৎসা করেন। আরও বলার যে আই সি ইউ—চিকিৎসার পর এই অন্ধকারাচ্ছন্ন, ভুতগ্রস্ত কাজের সংস্কৃতি প্রভাব ফেলছে সরকারি আইসিইউ গুলিতেও। সামগ্রিক ভাবে গুরুতর অসুস্থের চিকিৎসা করতে যে মস্তিষ্ক, জ্ঞান ও হৃদয়ের সমন্বয়ে তৈরী পারঙ্গমতা—তা অর্জন না করেই কিছু যন্ত্রের উপর নির্ভর করতে গিয়েই তা হচ্ছে। ফলে তা ডেকে আনছে সমূহ সমস্যা।

এতো গেল বিজ্ঞানের বিকৃতির দিক। তার থেকেও যা দুশ্চিন্তার, চিকিৎসার মূল ভাবনাটাকেই বদলে দেবার সংগঠিত চেষ্টা চলছে কর্পোরেটদের পক্ষ থেকে। দুষ্কর্মের সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা এবং তাকেই স্বাভাবিক বলে মনে করানোর সবথেকে শক্তিশালী পথ হচ্ছে, এটাই দরকারি আর মানুষের পক্ষে কল্যাণকর, সময়োপযোগী, বিশ্বচিন্তার অনুসারি

এমন এক লাগাতার প্রচার। চিন্তা আর সংস্কৃতিতে পরিবর্তন আনতে পারলে তা দীর্ঘস্থায়ী হয়। অপকর্ম যারা করে তারা অপকর্মটাকেই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বলে প্রতিষ্ঠিত করে। চিকিৎসা যে সেবামূলক প্রবৃত্তিসঞ্জাত একটি বৃত্তি ও ব্যবস্থা এই মূল ভাবনাকেই চ্যালেঞ্জ করা হচ্ছে। চিকিৎসা—সমাজসেবা নয়—এই ভাবনাকে যদি প্রতিষ্ঠিত করা যায়, তাহলে চিকিৎসাকে আলু পটলের মতো হাটে বিক্রি করার যে উন্মার্গগামিতা তার সামাজিক গ্রহণ যোগ্যতা তৈরি হয়। মানুষের প্রশ্ন তোলার মানসিকতা ও সাহসই চলে যায়। যেমন খুশি পয়সা নেব, চিকিৎসা করে, যেমন খুশী চিকিৎসা করব এই নির্লজ্জ ঘোষণাও—মানুষ তা নতমস্তকে দেবতার আশীর্বাদ বলে গ্রহণ করবে। ব্যবসা করবো গোবর কিংবা সারের ব্যবসার মতো, কিন্তু সমাজে আমার প্রতিষ্ঠাটা অন্যরকম হবে—এ দাবীও থাকবে।

'সেবা' শব্দটাকে জুরাসিক বলে তাকে ইচ্ছামত ব্যবসা করার অধিকারে রূপান্তরিত করার সময়ও কিন্তু আমরা এই ভাবনা থেকে সরে যেতে তৈরী নই যে সমাজকে স্নেহ ভরে রক্ষা করে, চিকিৎসা যে সম্মান পেয়েছে তা লঘু হোক। খুব পরিস্কার ভাবে সরবে বলার সময় এসেছে, ঠিক আছে মেনে নিলাম (খুশী মনে না হলেও) যে সরকারি ব্যবস্থার বিকল্প কর্পোরেট ব্যবস্থা এদেশে বিকশিত হবে। এবং তা ব্যবসা করবে। কিন্তু এ ব্যবসার রীতি-নীতি, ব্যবহারিক এবং আর্থিক আচরণ বিধিকে সুসংহত, যুক্তিগ্রাহ্য এবং তঞ্চকতা বর্জিত হওয়া দরকার। হওয়া দরকার পরিচ্ছন্ন। এর জন্য দেশের সরকার বাহাদুরকেই অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। তারও আগে সরকারের যা করা দরকার তা হচ্ছে এটা বোঝা যে, সরকারি চিকিৎসাকেন্দ্র ব্যবস্থা হচ্ছে মন্দির। তার পূজারি সরকার। তার শ্রী-ছন্দের দেখভাল ভালো করে করলেই একমাত্র তা হতে পারে।

## চিকিৎসার রাজনীতি

চিকিৎসার সংস্কৃতি, সত্তা আর সংগঠন কি রাজনীতি বিমুক্ত? এ প্রশ্নটা তোলা এ কারণেই যে, বাকি সব কিছু সাদা চোখে ধরা পরলেও—রাজনীতিটা পেছনের চোখ দিয়ে দেখতে হয়। আর তা না দেখতে পেলে তা এবং তার যুক্তিজালে অকারণে ও অযৌক্তিকভাবে প্রভাবিত হলে সমস্যাও বাড়ে। আমরা আবার সাধারণভাবে যা চোখের সামনে পর্দায় ভাসে—তা দেখতেই বেশী পছন্দ করি। রাজনীতিকে কূটবিদ্যা বলে সমীহ করি এবং শঙ্কিত হই। প্রায়ই বলে থাকি—আমি ওসবের মধ্যে নেই। আর এখানেই সর্বনাশ।

চিকিৎসাকে ক্রমাগত কাঠিন্যের মোড়কে ঢেকে, সাধারণের বোধবুদ্ধির বাইরে এক সামগ্রী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার যে চেষ্টা তা করা হয় অত্যন্ত পরিকল্পিত ভাবে ও উদ্দেশ্য নিয়ে। মূল লক্ষ্য হচ্ছে চিকিৎসাবিদ্যা কত জটিল, কত কঠিন তা সাধারণ মানুষের মনে প্রতিষ্ঠিত কার। তাতে চিকিৎসাবিদ্যার জ্ঞান ভান্ডের চাবিকাঠি যাদের হাতে থাকে—সেই প্রকৌশলীদের প্রতি মানুষের প্রতিষ্ঠিত শ্রদ্ধাভান্ড আরও বড় হয়। 'ও আপনি কি বুঝবেন'??—কোনো প্রশ্ন করলেই এই যে উত্তরের বুলেট পান সাধারণ মানুষ, এটা এই সচেতনভাবে সৃষ্টি করা বিজ্ঞানের হর্ম্যগৃহে সাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ করার লক্ষ্যেই নিবেদিত। একে শুধু সহজ সরল কৌতুহল কমানোর চেষ্টা বলে ভাবাটা যুক্তি সংগত নয়। নানান খোপ দিয়ে ভগ করা আমাদের সমাজে যিনি বিজ্ঞানের আলো পান—তিনি কখনও বা ভাবতে শুরু করেন (এবং তাকে ভাবানো হয়।) এ আলো একান্তভাবে তোমারই সম্পত্তি, একে হাতছাড়া

কোরো না। সামাজিক প্রতিষ্ঠা আর্থিক শক্তিবৃদ্ধির পরিপূরক। আর লব্ধ সামাজিক প্রতিষ্ঠাকে রক্ষা করার অন্যতম পথ হচ্ছে তাকে কুক্ষিগত করে রাখা, যাতে করে সাধারণের আগ্রহ এবং সমীহ থাকে ও বেড়ে চলে। এটা আরও ঘটে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে। মহাকাশ আর মানুষ—এ দুটার সম্পর্কেই মানুষের নিবিড় অনুসন্ধিৎসা থাকার ফলে—যারা এই দুই বিজ্ঞানের চাবি হাতে পান তাদেরকে সমাজ অন্য চোখে দেখে। যুক্তিশীল সমাজেও এটা ঘটে থাকে—আর আমাদের দেশের ভক্তির ঐতিহ্যে তা চিকিৎসকদের ভগবানের পরেই জায়গা দেওয়া হয়। জোর দিয়ে বলা দরকার—এই ভাবনাটা তৈরী আর তার প্রসার করা হয়—যথেষ্ট পরিকল্পিতভাবে এবং চাতুর্য্যের সঙ্গে।

জ্ঞান-বিজ্ঞানকে এই যে সাধারণের অগম্য এবং অবোদ্ধ মার্গে প্রদীপ করে আরতি করা—আর তার পান্ডা হিসাবে বিজ্ঞানীদের শ্রদ্ধা করা—এটা বিজ্ঞানকে কোঠরাবদ্ধ করে। তা যে ব্যাপক মানুষের প্রতিদিনকার জীবনে ঘটে চলা এক স্বাভাবিক বিষয় আর যুক্তি দিয়ে চোখ মেললে প্রত্যেকেই তার কিছুটা অন্ততঃ বুঝতে পারেন—এই ভাবনাকে দুর্বল করাই এর লক্ষ্য। চিকিৎসাবিদ্যায় এটা ঘটে আরও বেশি, এবং এদেশে। আদতে বিজ্ঞানের কথা বললেও এবং নিজেদেরকে যুক্তিশীল, তথ্যনির্ভর ও প্রকান্ড বিশ্লেষণধর্মী বলে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেও চিকিৎসা-বিদ্যার প্রতিদিনকার পথ চলা হয়ে দাঁড়ায় আদপে ভূমিকার থেকে সরলরেখায় উপসংহারে পৌঁছানো প্রকরণগত ঐতিহ্যে আপাদমস্তক ঢাকা। যুক্তি বিজ্ঞানের অহংকার, তথ্য বিশ্লেষণ তার পথ চলার মর্মর ধ্বনি। এর কোনওটাই থাকে না এদেশের

প্রবহমান চিকিৎসা বিদ্যার (যাকে আগেই আমি 'বিজ্ঞান' অভীধায় ভূষিত করা থেকে বিরত হয়েছি) প্রতিদিনকার রূপে। আর এর মূল ভিত্তি হচ্ছে আভিজাত্যের রাজনীতি, গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষার উদগ্র প্রচেষ্টা। কখনও বা কোনো অর্বাচীন এই ক্ষুধিত পাষাণে ধাক্কা দেবার চেষ্টা করলে তাকে কালাপাহাড় প্রমাণের চেষ্টাও এই ছক যাতে না ভাঙে তারই প্রকাশ।

পেশাকে সব নাগালের বাইরে, বিদ্যাটাকে সবার বোধের বাইরে রাখার রাজনীতির অন্য দিকটা হচ্ছে—বিশুদ্ধ বাণিজ্যের পাটীগণিত। সাধারণ মানুষ যদি ওটা বুঝেই যায় যে বেশীরভাগ শারীরিক সমস্যা কোনো ওষুধ ছাড়াই সারে, লাগে না কোনো বড় চিকিৎসক বা চিকিৎসালয়—তাহলে তো ঘোর অশান্তি। এত যে আয়োজন, বিনিয়োগ তা তো সব এই কুহকাবৃত বিজ্ঞানকে ঘিরেই। ঘোমটাই তো তার মুখচ্ছবি—হিজার তার শোভা বর্দ্ধন করে আগ্রহের মাত্রা বাড়ায়। অতএব তাকে রক্ষা করা দরকার—সব শক্তি দিয়ে। এই সহজ-সরল রাজনীতিটুকু আমরা যদি একটু না ধরার চেষ্টা করি—তাহলে আমাদেরই ক্ষতি।

## চিকিৎসায় মমত্বের ভাবনা - ভাঙাচোরা কাঠামোয় বসে চাঁদ দেখা

তাও সম্ভব এবং তাই করা দরকার। এই সেদিন মুগ্ধ বিস্ময়ে শুনলাম কোনও একজন চিকিৎসা ব্যাপারী ব্যঙ্গ করছেন—''ফুটপাতের চিকিৎসা কখনও পাঁচতারা হয় না''। পাঁচতারা চিকিৎসা যেন একটা মজলিস—যেখানে বাঈজী নাচবে, মাদক থাকবে,—ফোয়ারা ছুটবে স্ফূর্তির। নানান খানাখন্দ দিয়ে ভরা এদেশের উন্নয়নের ঘা-ময় দেহ আরও বেদনাবিধুর হচ্ছে

বাণিজ্যিক চিকিৎসার কামড় খেয়ে। চিকিৎসায় ব্যবসায়িক ব্যক্তি উদ্যোগ এদেশে বহুযুগ ধরেই ছিল। সরাসরি রোগীর সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করা হত বলে এবং জবাবদিহি আর দায়বদ্ধতার একটা মঞ্চ ছিল বলে—তা সমাজগ্রাহী এবং সমাজের পক্ষে সাহায্যকারী হিসাবে মানুষ গ্রহণ করত। কর্পোরেট এসে সেটাকে চাক-চিক্য আর বাহুল্য দিয়ে সাজাতে গিয়ে মূল বিষয়টিকে প্রায় অপসৃত করে। এতে প্রবহমান চিকিৎসা-সংস্কৃতির ক্ষতি, মানুষের ক্ষতি তো বটেই। চিকিৎসা ব্যবস্থার সঙ্গে মানুষের দুরত্ব ক্রমশ বাড়ছে। বাড়ছে ক্ষোভ-বিক্ষোভ যার অনিয়ন্ত্রিত এবং অশালীন প্রকাশ প্রায়ই দেখা যাচ্ছে। এগুলি অনভিপ্রেত এবং ক্ষতিকারক হলেও অসুখের গভীরে ঢোকা দরকার।

এটা একটা সংগঠিত চেষ্টা। চিকিৎসা যে পাওনা নয়, দেশের শাসকদের তাতে যে কোনও দায় নেই, চিকিৎসা, চাল-ডাল-তেল-মুড়ির মতোই কিনে খেতে হবে—এই ধারণাটাকে সাধারণ মানুষের মধ্যে বদ্ধমূল করে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। দেশের মানুষের চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতির মাপকাঠি গুলোকে তুলে দেওয়া হচ্ছে উন্নত যন্ত্রপাতির সমাহার হিসাবে। আর তা কণকমূল্যে কেনার জন্য মানসিকতাও তৈরী করা হচ্ছে। এই ব্যবস্থার পরিবর্তনে অগ্রণী ভূমিকা নেয়া দরকার সরকারের। 'মার্কেটিং' নামের শব্দের উপর ভাসমান এক কাকাতুয়া সভ্যতা ক্রমশঃ চিকিৎসার ধ্যান-ধারণাকে পাল্টে দিতে এগোচ্ছে, আমাদের সবার নিশ্চিন্ত শীতঘুমের সুযোগ নিয়ে। দুধের দোকান আর মদের দোকান পাশাপাশি থাকলে মদের দোকানেই ভীড় হয়ে যায়। এক্ষেত্রে যা করতে হয় তা হচ্ছে দুধের দোকানের সংখ্যা বাড়ানো। এ কাজটা করতে হবে সরকারকেই।

## মাথা খুলে ভাবতে হবে

কৃষ্ণা ভট্টাচার্যের মস্তিষ্কের কোষগুলি অসময়ে নুয়ে পড়েছিল। সাধারণভাবে যে ভাষায় কাজের কথা, মনের কথা বলতে আর শুনতে আমরা অভ্যস্ত তার থেকে বহুদূরে এক নতুন জগতে তিনি বাস করেছিলেন—বেশ কিছুদিন। সেখানেও তিনি যে ভাষায় কথা বলতেন তার ছন্দ বোঝার মানুষ ছিল—সেই মানুষ, যিনি মনে করেছিলেন এই নতুন ছন্দের জীবন, নতুন সুরের আলাপনটাকে আত্মস্থ করার কাজ তাঁকে আনন্দ দেয়। মানুষের ভাষা বোঝার কাজটা করতে গেলে সবার আগে একাত্মতা আনতে হয়, সাজাতে হয় ভালবাসার ডালি। ভাব, অভিব্যক্তি ব্যক্তিমানুষের শুধু নয়, আরও বড় করে সমাজের ঘটতে থাকা প্রবাহকেও তুলে ধরে। তার সবটাই ব্যক্ত নয়—বেশকিছুটা অনুভুতি দিয়ে তা বুঝতে হয়।

কৃষ্ণাদির পরিচর্যায় যন্ত্রের অনুষঙ্গের কোন অভাব কখনও ছিল না—যেমনটা সাধারণতঃ এখন থাকে না এখনকার উন্নত চিকিৎসার দাবিদার দোকানগুলোতে। কিন্তু ছিল কিছু একটা না পাওয়া—যা রণবীরদা শুধু নয়, আমাদের সবাইকে এখন পীড়িত করে। 'মানবিক' শব্দটা মধুর শোনালেও উপর চালাক, তস্করদের হাতে ব্যবহৃত হতে হতে জোলো হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তার থেকে ভালো কোনো প্রতিশব্দও তো নেই—যা চিকিৎসার সংস্কৃতি ও সত্তার অগস্ত্যযাত্রার অভিমুখ বদলাতে পারে ঘেঁটি ধরে। তারই অপেক্ষায় চেয়ে আমরা, আর কৃষ্ণাদি চোখে চেয়ে আছেন অচিনপুরে। কৃষ্ণা মেমোরিয়াল ট্রাস্ট আয়োজিত তৃতীয় কৃষ্ণা ভট্টাচার্য স্মারক বক্তৃতা, অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস, কলকাতা ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭।

**Late Krishna Bhattacharya**

Distinguished Teacher of Education,
West Bengal Education Service

**Sujeda Khatun**

B.A., LL.B. Student, Aligarh Muslim University and working for the increasing access to education among backward children of her community with the help of senior students

**Prajna Paramita Mandal**

Founder Member of Prantik, a group working on child rights and gender equality

Fourth Krishna Memorial Awards for Women Educationists, Students and Caregivers were Conferred on

**Sujeda Khatun** of the Sramik-Krishak Maitri Swasthya Kendra

and

**Prajna Paramita Mandal**, Social Activist for Homeless People

By **Prof. Sabyasachi Basu Ray Chaudhury**

on

22 February, 2017

# Krishna Trust

HB-232, First Floor, Sector-III, Salt Lake
Kolkata-700 106, Phone +91-33-23371801